দৈনিক আমাদের সময়

14 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ৬

শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্য

মোনায়েম সরকার

কোচিং, গাইড বই, প্রশ্ন ফাঁসের মতো ব্যবস্থা থেকে রক্ষা পেতে হলে এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে, যাতে টেকসই শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা যায়। শিক্ষা-সংক্রান্ত সব প্রতিষ্ঠানের অবাধ দুর্নীতি নির্মূল করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করতে না পারলে দেশের কোনো উন্নয়ন ফলপ্রসূ হবে না। আগে মানুষকে মানুষ বানাতে হবে। মানুষ যদি সত্যিকারের মানুষ হয়, উন্নয়ন অবশ্যই সম্ভব

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে জনমনে সীমাহীন অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এমন কোনো দিন নেই, যেদিন পত্রপত্রিকায় ও টেলিভিশনের টকশোগুলোয় আমাদের শিক্ষার অব্যবস্থাপনা কিংবা শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা না হচ্ছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষামন্ত্রক বা শিক্ষাবিষয়ক নীতিনির্ধারকরা তাতে কর্ণপাত করছেন, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। একটি অসুস্থ ধারার বিকলাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থায় ভর করে পুরো জাতি আগামীতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে বিষয়ে এখনই পরিকল্পনা নির্দিষ্ট করা দরকার। বাংলাদেশে মোটামুটি চার স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তর (বিশ্ববিদ্যালয়)। এই হলো আমাদের শিক্ষার প্রচলিত কাঠামো। এই চার স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরে আছে আরও নানা উপস্তর (মক্তব, গ্রামভিত্তিক শিক্ষা, কওমি শিক্ষা, তথাকথিত ইংরেজি মাধ্যম ইত্যাদি)। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাস্তর আগের চেয়ে আধুনিক হয়েছে এবং পাঠ্যক্রমে যুক্ত হয়েছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, এমনটিই শিক্ষাসংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন।

কিন্তু ভেতরের খবর খুবই হতাশাব্যঞ্জক। আমাদের অবুঝ শৈশবে আমরা যে প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছি, সেই শিক্ষাকে যদি বর্তমান দৃষ্টিকোণে ত্রুটিপূর্ণ বলে ধরা হয় তাহলে এ প্রশ্ন করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত নয় যে, সেই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা নিয়েই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক শিক্ষার সব সুযোগ পেয়েও, পরীক্ষায় সোনালি প্রতীক (গোল্ডেন এ+) পেয়েও কেন এ যুগের শিক্ষার্থীরা দুজনের বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না, তা পুরো জাতিকে চিন্তিত করে তুলেছে। তাহলে কি প্রশ্ন উঠতে পারে না– কোন শিক্ষা ভালো ছিল আগের কাঠামোবদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতি, নাকি আধুনিক সৃজনশীল পদ্ধতি?

৭ অক্টোবর দৈনিক আমাদের সময়ে মুহম্মদ জাফর ইকবাল 'আমার ভাঙা রেকর্ড' কলামে দেখিয়েছেন কোনো রকম লেখাপড়া না করেও বর্তমান পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থায় ৬০-৭০ শতাংশ নম্বর পাওয়া সম্ভব। আর কেউ যদি একটু খাটাখাটুনি করে ১০-২০ নম্বর পায়, তাহলে গোল্ডেন এ+ পাওয়া কোনো ব্যাপারই নয়। তার মানে হলো, আমাদের সময়ের সনাতন পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থার মানদণ্ডের বিবেচনায় এখন যারা জিপিএ ফাইভ পাচ্ছে, তারা মূলত ফেল করা শিক্ষার্থীর কাতারেই পড়ে। অর্থাৎ এখনকার ৮০ শতাংশ নম্বর পাওয়া ছাত্র এক হিসেবে অকৃতকার্য ছাত্রই বটে।

এই অকৃতকার্যকে কৃতকার্য করে তোলা এটা এক হিসেবে জাতির শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বলেই মনে হয়। কোনো কোনো শিক্ষাবিদ মনে করেন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানো দরকার। অবশ্য তাদের এসব কথার পেছনে অকাট্য যুক্তিও রয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আসলেই ঢেলে সাজানো দরকার কিনা, সে বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলার অধিকার আমরা কেউই রাখি না, যদি না সরকার সে কথা স্বীকার না করে। কেননা প্রতিষ্ঠিত সরকারি পলিসির বিরুদ্ধে কথা বলা এক অর্থে রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। কিন্তু কথা হলো, সমাজে যেহেতু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও শুভঙ্করের ফাঁকি ধরা পড়েছে, সে বিষয়ে অবশ্যই সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। যদি জনগণের পর্যবেক্ষণই ঠিক হয়, তাহলে সরকারের উচিত জনপ্রত্যাশা ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলিত সমস্যা সমাধান করা। আর তা না হলে সরকারের উচিত, সরকারে শিক্ষা পলিসি যে ঠিক তা যুক্তি দিয়ে জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া।

পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে পঞ্চম শ্রেণির কোনো শিশুর পরীক্ষা এত সমারোহে হয় না– সেটা হয় বাংলাদেশের মতো একটা গরিব দেশে। এখনকার পিএসসি পরীক্ষা (প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট) যেভাবে হয়, সেইভাবে হতো আমাদের সময়ের এসএসসি (ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষা। আমাদের আমলে ম্যাট্রিক পাস করলে একটা ছোটখাটো চাকরি পাওয়া যেত। আমার পরিচিত অনেক লোকই ম্যাট্রিক পাস করে সরকারি চাকরি করেছে। অথচ আজকের দিনে পিএসসি নামের যে অদ্ভুত ও শিশু নির্যাতনকারী পরীক্ষা চালু হয়েছে তার ফলাফল ও সার্টিফিকেট কোনো কাজেই লাগে না। মাঝখান থেকে কিছু অপ্রত্যাশিত দুর্বৃত্তপনা যুক্ত হয়েছে। আমাদের সময়ে স্কুলে স্কুলে প্রাইমারি পরীক্ষা হতো, যে পাস করত সে হাইস্কুলে যেত এবং হাইস্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারলে যেত কলেজে। উচ্চশিক্ষা নিত খুবই অল্প লোকে। যাদের মেধা এবং সচ্ছলতা ও অটুট ধৈর্য ছিল তারাই উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করত। এখনকার সিস্টেমটা এতই অদ্ভুত যে, বাংলাদেশে প্রাইমারি স্কুলে ফেলের সংখ্যা নেই বললেই চলে (বেশিরভাগ পাস করে বা করানো হয়)। তাহলে কি আমাদের শিক্ষা অনেক এগিয়ে গেছে বলব? সংখ্যায় এগিয়ে থাকলেও আসলে আমরা অনেকখানি পিছিয়ে গেছি। অনেকখানি ক্ষতি হয়ে গেছে আমাদের। এখন সবাই পাস চায়, জ্ঞান চায় না। পাস এখন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার এক নম্বর চাওয়া। শিক্ষার গুণগত মান যাই হোক না কেন, সংখ্যাগত মান বৃদ্ধিতে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকার সদা তৎপর। এখন একটা ফাইভের শিশুকে ১৮ ঘণ্টা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় (শুধু ঘুমানো ও প্রাতঃকৃত্য ছাড়া)। তার অবশ্যই কোচিং করানোর অর্থ জোগান দিতে হয়। একজন লোক (বাবা-মা, কাজের ছেলে বা মেয়ে) তার দেখাশোনার জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়, প্রশ্ন ফাঁস হলে সেই ফাঁস করানো প্রশ্ন জোগাড় করার অনৈতিক কাজে জড়িত থাকতে হয়। রেকর্ডসংখ্যক নম্বর পাওয়ার জন্য প্রশ্ন ফাঁস করানোর চেষ্টা করতে হয়। সব মিলিয়ে একটা বাজে বিষয়ের চর্চা আর কি। সরকারি ব্যয়ে একটি পরীক্ষা চালাতে রাষ্ট্রের সব স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবহার করতে হয় (প্রয়োজন অনুযায়ী)। এটা একটা দক্ষযজ্ঞই বটে। অথচ মজার বিষয় হলো এই পরীক্ষার কিছুই কোনো কাজে লাগে না। আগের দিনে ফাইভ পাস কোনো কাজে লাগত না, এখনকার দিনের ফাইভ পাসও কোনো কাজে লাগে না অথচ আগের দিনে ফাইভ পাস করাতে সরকারের এক টাকাও অপচয় হতো না। এখন ফাইভ করাতে সরকারের শত শত কোটি টাকা বিনা কারণে অপচয় হচ্ছে। মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে অবুঝ শিশুরা। পরিবারের টাকা ব্যয় হচ্ছে [illegible] কোচিং ব্যবসায়ীরা ধনী হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে অভিভাবকের [illegible] মূল্যবান কর্মঘণ্টা।

আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি বদলানো দরকার, পাঠ্যক্রম বদলানো দরকার, শিক্ষকদের মর্যাদার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো দরকার। বদলানো দরকার শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ। খোলা আকাশের নিচে আর যাই হোক ডিজিটাল কন্টেন্ট কিংবা সৃজনশীল পদ্ধতি হয় না। পৃথিবীর যারা বিখ্যাত মানুষ তারা কেউই সৃজনশীল পদ্ধতির পাস নয়। বহু জ্ঞানীগুণী যেমন লালন-হাসন-গগন-রবীন্দ্র-নজরুল সৃজনশীল পাস নন, তারা নিজেরাই সৃজনশীলতার উদাহরণ। বাংলাদেশে কোনো দিনই শিক্ষার উন্নয়ন আশা করা ঠিক হবে না যদি না– ১. শিক্ষাক্ষেত্র সরাসরি সৎ-জ্ঞানী-গবেষক ও সৃজনশীল শিক্ষকের হাতে তুলে দেওয়া না হয়। ২. সব খাতের চেয়ে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বেশি দেওয়া না হয় (বর্তমানে আমাদের দেশে জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ ব্যয় করা হচ্ছে ভারতে এর পরিমাণ ৪ শতাংশের ওপর)। ৩. শিক্ষার পরিবেশ তথা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সুস্থ-সুন্দর নিরাপদ করা না হয়। ৪. শিক্ষকদের মর্যাদা-সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা না দেওয়া হয়। ৫. পাঠ্যপুস্তকে বিজ্ঞানমনস্ক, ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা না হয়। ৬. সমাজে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রতি আকাঙ্ক্ষা তৈরি করা না হয়।

পেটে ক্ষুধা নিয়ে কেউ কাজ করতে চায় না। যে চায় একসময় সেও কাজ করা থেকে বিরত হয়। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে পাঁচ বছরেই একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব। এ জন্য লাগবে জনগণের যৌক্তিক পরামর্শ শোনার উদারতা আর সেই অনুযায়ী কাজ করার মানসিকতা। বর্তমানে বাংলাদেশে যেভাবে শিক্ষাব্যবস্থা চলছে, এই শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের একজন মানুষও খুশি কিনা সন্দেহ। তবু আমাদের শিক্ষা চলছে এবং ভালো করেই চলছে। এই চলাকে বিজ্ঞাপনের জোরে চলা বলাই ভালো। বাজারে নতুন পণ্য এলে বিজ্ঞাপনের জোরে কিছু দিন তা চলে– তারপর ভালো না হলে আমজনতা সেই পণ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকেও মানুষ এখন মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশের কোনো স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগে ঘুষ লেনদেনের চিত্র দেখলে যে কোনো বিবেকবান মানুষই আঁতকে উঠবেন। এ দেশের কোনো স্কুল-কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে হলে ৫ থেকে ১০ লাখ টাকা ঘুষ [illegible] প্রহরী [illegible] পের ক্ষেত্রে [illegible] থেকে ৫[illegible] টাকা [illegible] দিতে হয়। [illegible] কোনো শিক্ষক যখন শিক্ষাদানের মতো পবিত্র পেশায় ঢোকার আগেই মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ দেন তখন তিনি কীভাবে শিক্ষার্থীকে নীতিনৈতিকতা শিক্ষা দেবেন? গত ৭ সেপ্টেম্বর একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রতিবেদন বের হয়– যার শিরোনাম– 'টাকার কাছে হার মানছে মেধা'। যারা সেই প্রতিবেদন পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কিছুদিন আগেও শিক্ষা খাতের দুর্নীতি ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এখন সেই দুর্নীতি যাও কমেছে তা উল্লেখ করার মতো নয়।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে দুর্নীতির ও অব্যবস্থাপনার এমন এক কঠিন জালে আটকা পড়েছে, যা থেকে মুক্তি পেতে হলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কেই হস্তক্ষেপ করতে হবে। তার হস্তক্ষেপ ছাড়া শিক্ষা খাতের এ অচলায়তন ভাঙা মোটেই সম্ভব নয়। অবশ্য তিনিও কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে একবার কিছু ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এসে আমাকে বলেছিলেন– স্যার, আমাদের কোর্স যদি তিন বছরের পরিবর্তে চার বছর করা হতো, তাহলে বিদেশে গিয়ে আমরা ইঞ্জিনিয়ারের মর্যাদা পেতাম। দেশেও রেমিট্যান্স আসত। এ সম্পর্কে আমি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার কোর্স চার বছর করার ঘোষণা দেন। তখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত এসএইচকে সাদেক। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের তিন বছরের কোর্স চার বছর হতে সময় লেগেছিল সাড়ে তিন বছর। একদিন আমি আমার একটি নিবন্ধে লিখি– শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি ডিপ্লোমা কোর্সের ব্যাপারটা এনজয় করছে? প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরও কেন এটা কার্যকর হচ্ছে না? ঘটনার উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, যে দেশে প্রধানমন্ত্রীর আদেশ কার্যকর হতে সাড়ে তিন বছর লাগে, সে দেশের শিক্ষা রাতারাতি বদলাবে না।

বলা হয়ে থাকে প্রকৃতিই মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় দেখা যায়, প্রকৃতির কাছে যাওয়ার সুযোগই পায় না ছোট শিশু-কিশোররা। পিএসসি, জেএসসির মতো অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে শিশুরা তাদের শৈশব-কৈশোর হারিয়ে ফেলছে, নষ্ট করে ফেলছে তাদের সৃজনশীলতা। সারাক্ষণ চার দেয়ালে বন্দি থেকে মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের স্বপ্ন। শিশুদের ওপর থেকে যতটা সম্ভব লেখাপড়ার চাপ কমাতে হবে। এ জন্য সময়ের কথা বিবেচনায় তাদের পাঠ্যপুস্তক তৈরি করতে হবে। পাঠ্যবই আবোল-তাবোল বিষয় বাদ দিয়ে যুগোপযোগী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ ব্যাপারে উদাসীন হওয়া চলবে না। বর্তমান শিক্ষা আইনে শিক্ষকদের জ[illegible] বিধান রাখা হয়েছে, কিন্তু গবেষণার জন্য পুরস্কার[illegible] করা হয়নি– এটাও একটু ভেবে দেখা দরকা[illegible] ভেবে দেখা– একজন এসি ল্যান্ডের চেয়ে [illegible] অধ্যাপক পদ-পদবিতে অনেক মর্যাদাবান, [illegible] ল্যান্ডের জন্য ৭০ লক্ষ টাকা দামের গাড়ি কে[illegible] আবাসনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে; কিন্তু অধ্যাপ[illegible] ন্যূনতম জীবনমানের নিশ্চয়তা নেই। এ [illegible] সুনজরে আনা দরকার। কিছুদিন আগে বিবি[illegible] সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠানে শুনছিলাম। সে[illegible] প্রজন্মকে তাদের ক্যারিয়ার নিয়ে প্রশ্ন করা [illegible] শিক্ষক হতে আগ্রহ দেখায়নি। এর কারণ [illegible] উল্লেখ করেছে– শিক্ষকতা পেশায় কোনো [illegible] সচ্ছলতা নেই, জীবন উপভোগের কোনো [illegible] সুতরাং সর্বস্ব ত্যাগ করে মেধা দিতে এখ[illegible] আগ্রহী নয়। কথাটা শুনতে যতই খারাপ শো[illegible] এটাই বাস্তবতা।

একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকা [illegible] খাতে বছরে ব্যয় করে ৯০০ বিলিয়ন ডল[illegible] খাতে ব্যয় করে মাত্র ১ বিলিয়ন ডলার। প্রকৃ[illegible] মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সামরিক খাতে এ[illegible] আমেরিকাকে তো আজ সর্বস্বান্ত করছে[illegible] পৃথিবীকেও ফেলেছে চরম হুমকির মধ্যে। এ[illegible] প্রকট হবে, যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতে[illegible] প্রেসিডেন্ট হন। আমাদের দেশের শিক্ষ[illegible] যেভাবে চলছে, এভাবে চললে অদূর ভবিষ্[illegible] ট্রাম্পের মতো হিতাহিত জ্ঞানশূন্য প্রেসিডেন্ট[illegible] ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখক সৈ[illegible] আলীর (১৯০৪-৭৪) সান্নিধ্যে আসার সৌভা[illegible] তিনি একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলে[illegible] 'ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর' এ কথা যদি সতি[illegible] বিশ্বাস করি, তাহলে অবশ্যই জ্ঞানার্জনে[illegible] সুন্দর ও নান্দনিক করতে হবে। সংখ্যাগত [illegible] গুণগত পাস বাড়াতে হবে। কোচিং, গ[illegible] ফাঁসের মতো ব্যবস্থা থেকে রক্ষা পেতে হ[illegible] আবিষ্কার করতে হবে, যাতে টেকসই শি[illegible] করা যায়। শিক্ষা-সংক্রান্ত সব প্রতিষ্ঠানে[illegible] নির্মূল করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি ক[illegible] দেশের কোনো উন্নয়ন ফলপ্রসূ হবে না। [illegible] মানুষ বানাতে হবে। মানুষ যদি সত্যিকা[illegible] উন্নয়ন অবশ্যই সম্ভব।

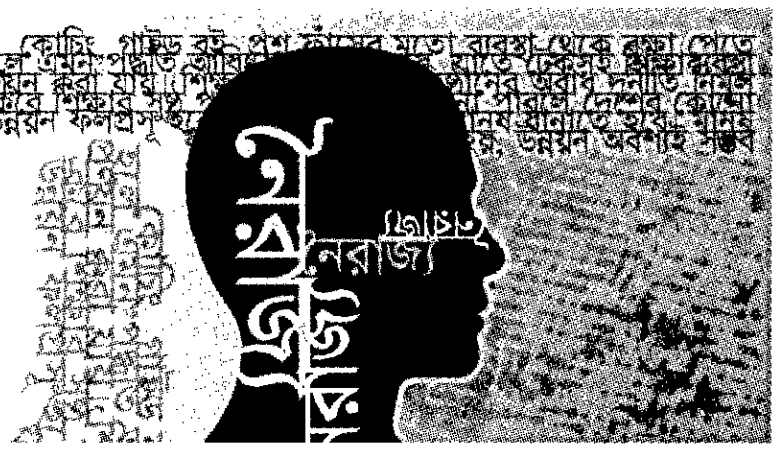

লেখক : কলামনিস্ট